পুতুলনাচের ইতিকথা: প্রেমের বিচিত্র রূপ

(*পুতুলনাচের ইতিকথা* উপন্যাস, স্নাতকোত্তর চতুর্থ সেমিস্টার)

Paper: 404 (1)

মানিক-উপন্যাসে জীবনের জটিলতা, দুর্জ্ঞেয় অন্তর্জীবনের রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা লক্ষিত হয়েছে বারংবার। তাঁর নিজের কথায়, 'জীবনকে আমি যেভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি, অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি' (*কেন লিখি*, ১৯৪৪)। তাঁর উপন্যাসগুলি বিচিত্র মানুষের বিচিত্র কথায় ভরপুর। নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব, অস্তিত্বের সংকট অনেকক্ষেত্রেই তাঁর মূল চরিত্রগুলির শরীরে জড়িয়ে। মানুষের অন্তর্নিহিত মনোবৃত্তির পরিচয় তাঁর লেখনীতে গোপন থাকেনি, বরং কলমের আঘাতে তা উৎপাটিত ও উদ্ঘাটিত হয়েছে পাঠকচক্ষুর সম্মুখে। তাঁর অক্ষয়কীর্তির চরম নিদর্শন যে উপন্যাসগুলি, তার মধ্যে অগ্রভাবে থাকবে *পুতুলনাচের ইতিকথা*। সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক ছাড়াও অসামান্য সব চরিত্রচিত্রণের জন্যও উপন্যাসটি বিখ্যাত। উপন্যাসের নামকরণটিও প্রশংসার দাবি রাখে, এই উপন্যাস অসাধারণ তাৎপর্যবাহী ও ব্যঞ্জনাধর্মী। উপন্যাসে নিয়তি ও মৃত্যু এক অমোঘ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও *পুতুলনাচের ইতিকথা*-র অন্দরে রয়েছে এক আকর্ষণীয় বিষয়, তা হল প্রেমের বিচিত্র রূপ। সমাজ-গৃহীত ও সমাজ-গর্হিত প্রেমের সরল-জটিল নানান রূপ। আমাদের বর্তমান আলোচনার অবকাশও তা নিয়েই।

• শশী-কুসুম: ভোরের প্রসন্ন কুসুম ঝরে গেল যে অবুঝ প্রেমে---

শশী-কুসুমের প্রেম সমাজ নামক প্রতিষ্ঠানের কাছে অবৈধ প্রেম। পরিণতিহীন প্রেম। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শশীকে ঘিরে বাকি চরিত্রগুলি আবর্তিত হয়েছে। আর কুসুম উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় নারী চরিত্র। কাজেই আলোচনার শুরু তাদের প্রণয় সম্পর্ক দিয়ে করাটাই যথার্থ বলে মনে করা গেল। কুসুম বিবাহিতা। শশীর বন্ধুস্থানীয় পরানের স্ত্রী সে। তেইশ বছরের 'বাঁজা' অর্থাৎ সন্তানহীনা বা বন্ধ্যা। স্বাস্থ্যবতী, অফুরন্ত জীবনীশক্তির অধিকারিণী গ্রামের মেয়ে, গ্রাম্যবধূ হলেও সে আশ্চর্যভাবে সংস্কারমুক্ত এক নারী। তার স্বভাব, আচরণ বাধাবন্ধনহীন। শশীকে সে ভালোবাসে বলেই অকপটে তার সঙ্গে কথা বলে, নির্দ্বিধায় তালবনে অপেক্ষা করে। শশী কুসুমের খাপছাড়া

কথায় ব্যবহারে ‘মিষ্টি ছন্দ’ খুঁজে পেলেও, তার মনে যে কল্পিতা বা স্বপ্ন-নারীর আদল রয়েছে; তার সাথে কুসুমকে মেলাতে পারে না। কুসুমের অনর্গল বকা, ইচ্ছে করে মিথ্যা কথা বলা, 'মুখস্থ বুলির মতো একরাশ তোষামোদের কথা', অকারণ হাসি, অভিমান-অনুযোগ --- এই সকল কিছুর মধ্যে শশী একটা টান অনুভব করে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। চঞ্চলা, প্রগলভা কুসুমের আচার-আচরণ শশীর নিস্তরঙ্গ ডাক্তারি জীবনে, অসুস্থ মানুষের ভিড় ঠাসা জীবনে এক ঝলক শীতল বাতাসের মতো মনোরম মাত্র। শিক্ষিত, স্বপ্নদর্শী ডাক্তার শশীর অবসরের খেয়াল সে। শহুরে শিক্ষার অহংকার ও মধ্যবিত্ত মনকে ডিঙিয়ে শশী কোনদিনই কুসুমকে নিজের করে পেতে চায়নি। তাই 'ছোটবাবু' আর 'পরানের বৌ'-এর মধ্যে দূরত্বের দেয়াল কখনও ভাঙেনি। কুসুম কিন্তু ভাঙতে চেয়েছিল। সমাজকে, সমাজের মানুষকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে শশীর হাতদুটোকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল। নিজমুখে বলেও ছিল—'এমনি চাঁদনি রাতে আপনার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে সাধ হয় ছোটোবাবু।' শশীর অতি সাধের গোলাপ চারা পায়ে দলিত করে ইঙ্গিতপূর্ণ ভঙ্গিতে শশীকে বলেছিল -- 'ইচ্ছে করেই দিয়েছি। চারার জন্য এত মায়া কেন?' আর সর্বোপরি সেই অকপট নির্লজ্জ (লজ্জা কুসুমের মতো নারীর ভূষণ নয়, নির্লজ্জতাই তার সম্পদ) ঘোষণা -- 'আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?' কিন্তু শশী তো কুসুমকে এভাবে গ্রহণ করতে চায় না। কাজেই কুসুমের নিবেদিত শরীর-অর্ঘ্য শশীর দ্বারা সহজেই প্রত্যাখ্যাত হয়। একবার নয়, বারবার। পাঠকের স্মরণে পড়বে বর্ষামুখর দিনে একাকী শশীর ঘরে কুসুমের আগমন। সেদিন কুসুমের মনের ইচ্ছার সন্ধান পেয়েছিল বলেই শশী তাকে নিজের যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে নিবারিত করতে চেয়েছিল— 'আমরা ছেলেমানুষ নই, ইচ্ছে হলেই একটা কাজ কি আমরা করতে পারি? বুঝে সুঝে কাজ করা দরকার।' উত্তরে কুসুম হয়ে উঠেছিল দুর্বোধ্য, রহস্যময়ী।

বিচিত্র কুসুমের প্রেম। স্পষ্টও বটে। 'দেবদাস'-এ পার্বতী সই মনোরমাকে বলেছিল, যে মানুষ নিজের, তার কাছে কোনও লজ্জা করতে নেই। আমরা কুসুমের মধ্যেও প্রেমের এই দ্বিধাহীন রূপকে লক্ষ্য করি। তাই তো ঔপন্যাসিক জানান—

শশী চলিয়া গেলে অন্ধকারে বেগুন খেতে দাঁড়াইয়া কুসুম একটু হাসিল। সামনে গাছের মাথার কাছে একটু আলো হইয়াছে। কুসুম জানে ওখানে চাঁদ উঠিবে। চাঁদ উঠিলে, চাঁদ উঠিবার আভাস দেখিলে কুসুম যেন শুনিতে পায় –

ভিনদেশি পুরুষ দেখি চাঁদের মতন

লাজরক্ত হইলা কন্যার পরথম যৌবন।

কে সে কিশোরী, ভিনদেশি পুরুষ দেখিয়া যার লজ্জাতুর প্রেম জাগিত? সে কুসুম নয়, হে ভগবান সে কুসুম নয়।

বাস্তবিকই কুসুমের প্রেম লজ্জাতুর কোমল প্রেম নয়। শশীর সঙ্গে তার প্রেমকে সমাজ বৈধতা না দিলেও তা নিয়ে তার কোনও মাথাব্যথা নেই। সে প্লেটোনিক প্রেমেও বিশ্বাসী নয়। রক্ত-মাংসের পরিপূর্ণ যুবতী সে। শুধু মনের মিলনে তার তৃপ্তি হয় না। কিন্তু শশী কুসুমের এই নিঃসংকোচ ভালোবাসাকে স্বীকৃতি দিতে পারে না। অবশেষে আসে সেই দিন যখন প্রেমোন্মুখ, প্রেমাসক্ত কুসুমের মৃত্যু ঘটে। আত্মিক মৃত্যু। তার প্রেম ছিল সত্যিকারের জীবন্ত প্রেম। যে প্রেম ভালোবাসার মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু অবুঝ প্রেমিকের কাছ থেকে প্রকৃত সাড়া না পেয়ে সে প্রেম অকালে মরে গেছে। অভিমানী প্রেম চরম প্রতিবাদে নিজেকে দয়িতের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছে চিরতরে। 'তুমিও রইলে আমিও রইলাম'— শশীর এই অসার যুক্তির হাতের পুতুল হতে চায়নি কুসুম। তাই কালের অনিবার্য নিয়মে গাওদিয়া ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে বিশ্বস্ত স্বামী পরানের সঙ্গেই বাকি জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মানিকের অপর জনপ্রিয় উপন্যাস '*পদ্মানদীর মাঝি*'র কপিলা চরিত্রের সাথে কুসুমের কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কপিলার মতোই কুসুম উচ্ছল, ছলনাময়ী, রহস্যরসে ভরপুর— আসলে দুই নারীই জীবনসাধিকা, সংসারের সাধারণ নিয়মকে ভেঙেচুরে নিজেদের মতো করে গড়তে তারা সিদ্ধহস্ত। কিন্তু দুজনের পরিণতি তাদের স্রষ্টা এক হতে দেননি। কপিলা যেখানে ময়নাদ্বীপ যাত্রার পথে কুবেরের সঙ্গিনী হয়েছে, কুসুমের জন্য সেখানে শুধুই এক বুকভরা বেদনা। তবে কুসুম ও কপিলা এক নয়। কুসুম অনেক বেশি আত্মস্বাতন্ত্রে গর্বিতা। তার প্রেম শুধু একতরফে ভালোবেসে যেতেই

শেখায় না; শেখায় নিজের স্থান, নিজের প্রয়োজনীয়তাকে জানান দিতেও। তাই প্রিয়তমের দীর্ঘদিনের উপেক্ষা, অবহেলা, অনাদর কুসুমের আত্মসম্মানকে আঘাত করে। আর সেখান থেকেই জন্ম নেয় প্রতিবাদী প্রেম। শশীর তালবনে ডাকার কথা শুনে সে বলেছে -

কথা বলবেন? আজ প্রথম আমাকে যেচে কথা বলতে এলেন, তাও তালবনে ডেকে।

প্রসঙ্গত কুসুমের কয়েকটি উক্তি তুলে ধরা যাক –

১। তামাশাই করলেন চিরকাল, তাই ডাকলে মনে হয় তামাশা করার জন্যেই বুঝি ডেকেছেন।

২। কী করে বুঝবেন? মেয়েমানুষের কত কী হয়, সব বোঝা যায় না। হলেনই বা ডাক্তার! এ তো জ্বরজ্বালা নয়।

আর হাসিমুখে বলা সেই তীব্র, স্পষ্ট, মর্ম ভেদ করা উক্তি –

৩। পর কোথা হলেন? তালবনে ঝোপের মধ্যে বসে পরের সঙ্গে আমি কথা বলি নাকি? ঠিক অতটা সস্তা নই ছোটোবাবু।

চলে গেল কুসুম। শশীকে ছেড়ে যাবার আগে তার নিরাসক্ত প্রেমের জবাব দিয়ে গেল। আর শশী বুঝিল – 'ফুটিয়া ঝরিয়া গিয়াছে, কুসুম মরিয়া গিয়াছে, – তারই চোখের সামনে, তারই অন্যমনস্ক মনের প্রান্তে।'

প্রেম মানুষের চলার পথের পাথেয় হয়ে ওঠে। দেরিতে হলেও শশী নিজের অন্তরের কথা শুনতে পেরেছে। তাই যে কুসুম 'এতকাল ধরে জড়িয়ে জড়িয়ে' তাকে বেঁধেছে, বিদায়বেলায় তার জন্য শশীর চিত্ত ব্যাকুল হয়েছে ব্যাপকভাবে। নিজের দীর্ঘলালিত সংস্কার, শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজভাবনা সব তুচ্ছ হয়ে গেছে প্রেমের কাছে। দীর্ঘদিনের অবহেলা হঠাৎই এক দুর্নিবার আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। অকপট উচ্ছ্বাস অনুনয় হয়ে ঝরে পড়েছে— 'ভয়ানক মন কাঁদবে বউ, জীবনে আমি কখনও তা হলে সুখী হতে পারব না।' কিন্তু আজ আর শশীর ঘর ছাড়ার ডাকে কুসুম বিগলিত হয় না, ঘর ছেড়ে পথেও নামে না। লাল টকটকে করে তাতানো লোহা যে ঠান্ডা হয়ে গেছে। কুসুম জানে Out of sight out of mind, তাই বলে— 'আপনার কাছে আমি কত তুচ্ছ...দুদিন পরে মনেও পড়বে

না আমাকে।' এও প্রতিবাদিনী নারীর আরেক প্রতিবাদ বৈকি। যে প্রেমিককে নিয়ে একদিন ননদ মতির সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করত, নানা কৌশল করত, আজ সেই প্রেমিককে, জীবনের প্রিয় মানুষটিকে শেষবেলায় সে উপহার দিল — অন্তরে সুপ্ত নানা ঝলসানো কথা – শিক্ষিত শশী অশিক্ষিত গ্রাম্যবধূর অকাট্য যুক্তির ধারেকাছে দাঁড়াতে পারলো না। 'শরীর। শরীর। তোমার মন নাই কুসুম?' একদা কামাতুরা, দেহী কুসুম জানিয়ে গেল তার শরীরের মৃত্যু হয়েছে, মনেরও। তার 'ভয়ানক উপবাসী ভালোবাসা' আজ আর প্রভূত প্রাচুর্যেও সন্তুষ্ট হবে না। একসময় যা ছিল বহুকাঙ্খিত, আজ তা হয়েছে বিরাগের বস্তু। তাই – 'অনাদৃত প্রেম অকাল সিঞ্চনে বাঁচিয়া উঠে নাই' (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*)। শশী নিশ্চয়ই জানত, 'বলিছে সোনার ঘড়ি টিক্ টিক্ টিক্।/যে জন না শোনে তারে ধিক্ শত ধিক্।' সময়ে ভালোবাসার মর্যাদা দিতে না পারায় এ ধিক্কার তার প্রাপ্য।

প্রেম মানুষকে অচেনা করে তোলে, নতুন করে তোলে। ঔপন্যাসিকের ভাষায় – 'এ শশীকে যেন চেনা যায় না। এমন দীনভাব সে কোথায় পাইল, কোথায় শিখিল এমন কাঙালপনা? কিন্তু শত চেষ্টা, শত মিনতি, শত প্রেম নিবেদন সত্ত্বেও কুসুমকে বাপের বাড়ি যাওয়া থেকে আটকানো গেল না। পরিণয়ে পরিণতি পেল না শশী-কুসুমের প্রেম। এক ছাদ হল না। কিন্তু এক আকাশ তাদের থেকে কেড়ে নেবে কে? গাওদিয়া আর কুসুমের বাপের বাড়ির আকাশ তো একটাই। হারানো হিয়ার নিকুঞ্জপথে শশী বলে উঠবে – 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর আজ, ফিরে আয় ফিরে আয়।' কুসুমের প্রেম তো ঠুনকো নয়, ক্ষণিক আলোর ঝলকানি নয়। 'তালবনে শশী কখনও যায় না। মাটির টিলাটির উপরে উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।' অতএব, কে বলল কুসুম গাওদিয়া ত্যাগ করেছে? প্রেমের মনোময় রূপ নিয়ে, বিরহের শান্ত সৌম্যভাব নিয়ে সে শশীর অন্তরেই রয়ে গেছে। সার্থক কুসুমের প্রেম। শশীর জীবন উপলব্ধিকেই সে অন্য খাতে বইয়ে দিয়েছে। সে শশীর ঘড়ায় তোলা জল নয়, অতল দীঘির জল। কবিগুরুর গানে আছে— 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'। কুসুম এই দুয়ের ভেদ না চাইলেও শশী বারবার এই ব্যবধান রেখে চলেছে। তাই কুসুম শেষ পর্যায়ে এসে বলল— 'আপনি দেবতার মতো ছোটোবাবু'। অর্থাৎ শশীকে সে দূরবর্তী পূজনীয় দেবতারূপেই রাখল। প্রেম আর পূজা যখন এক

হতে পারল না, তখন দয়িতের জন্য শুধু পূজাই তোলা থাকল। মানিকের অন্য উপন্যাস '*শহরবাসের ইতিকথা*'র সন্ধ্যা চরিত্রটির একটি উক্তি শোনা যাক (যদিও প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ ভিন্ন, শুধুমাত্র উক্তির সাজুয্যের জন্যই কথাটির উল্লেখ করা হল)— 'কেন যাব? আমায় দেখতে দেখতে একজনের মোহ জাগবে, আর সে ডাকামাত্র লক্ষী মেয়ের মতো চলে যাব? আমি মানুষ নই?' পাশাপাশি কুসুমের উক্তিকে রাখা যাক— 'কেন যাব?...আপনি বুঝি ভেবেছিলেন যেদিন আপনার সুবিধে হবে ডাকবেন, আমি অমনি সুড়সুড় করে আপনার সঙ্গে চলে যাব? কেউ তা যায়?' বাস্তবিকই মেয়েরা শুধু শরীরের মূল্য চায় না প্রেমিকের কাছে, সম্মান সম্ভ্রমও চায়। শশী যা কুসুমকে দিতে পারেনি।

• পরান-কুসুম: নিস্তরঙ্গ প্রেমের অপর নাম কর্তব্য---

পুতুলনাচের ইতিকথা শুরু যে বজ্রাঘাতে মৃত হারু ঘোষকে দিয়ে, পরান তার ছেলে। একান্ত নির্বিরোধী, শান্ত প্রকৃতির মানুষ। তার শ্বশুর অনন্তের কথানুযায়ী 'সে জলের মানুষ'। জেদি, একরোখা কুসুমের স্বামী সে। বাবার অবর্তমানে পরান পরিবারের সর্বময় কর্তা হলেও কুসুমের ওপর তার কর্তৃত্ব চলেনা। বরং সে নিজেই কুসুমের ইচ্ছার দাস, তার অনুগত। এহেন মাটির মানুষ পরানের সঙ্গে উদ্দাম যৌবন ভরপুর কুসুম তাই সন্তুষ্ট হতে পারে না। সে আকর্ষিত হয় শশীর প্রতি। যদিও উপন্যাসে এর কোনো সুনির্দিষ্ট কারণোল্লেখ নেই। আমরা এর জন্য প্রেমের জটিল দুর্বার গতি ও কুসুমের মনের দুর্বোধ্য অগম্য স্থানকেই দায়ী করে ক্ষান্ত হতে পারি। স্বামীর বন্ধুর প্রতি আকর্ষণ থাকলেও স্বামীকে যে কুসুম উপেক্ষা করে এমনটাও নয়। বরং পরানের পরিবারের সকলকে নিয়েই সে থাকে, স্বাভাবিক ঘরকন্না করে এবং মাঝে মাঝে ডাল পুড়িয়ে নিজের কিছু খামখেয়ালি মনোভাবের পরিচয় দেয়। তবু শশীকে দেখলে, তার নৈকট্যে যে কুসুমের শরীরে জোয়ার ওঠে, পরানের সামীপ্যে সে ধরনের কোনও বর্ণনা বা ইঙ্গিত আমরা পাই না।

পরিশ্রমী অথচ আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত, নিরীহ পরানের পক্ষে রহস্যময়ী স্ত্রীর স্বভাব অনুধাবন করা সম্ভবপর নয় স্বাভাবিকভাবেই এবং সে তার চেষ্টাটুকুও করেনি। কুসুমকে নিয়ে তার মনে কোনও দোলাচলতার সৃষ্টি হয়নি। তাই উপন্যাসের শেষে শশীকে ছেড়ে, গাওদিয়া ছেড়ে কুসুম যে

নির্বাসনে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতেও পরান স্ত্রী-এর কথামত সম্মতি জানিয়েছে। বলা যায়, কুসুমের শশীহীন জীবনে পরান সহায়কের ভূমিকা পালন করতে উদ্যত হয়েছে, সেটাও হয়তো প্রকৃত কারণ না জেনে। পরান-কুসুম সমাজের চোখে স্বামী-স্ত্রী হলেও তাদের প্রেমের প্রাবল্য উপন্যাসের কোথাও নেই। উপন্যাসের একেবারে শেষের দিকে কুসুম শশীকে জানিয়েছে – 'সাধ আহ্লাদ আমার কিছু নেই, নিজের জন্যে কোনো সুখ চাই না— বাকি জীবনটা ভাত রেঁধে ঘরের লোকের সেবা করে কাটিয়ে দেব ভেবেছি —।' পরানের প্রতি কুসুমের এই নিরুচ্চার প্রেমের মধ্য দিয়ে তার কল্যাণী রূপটি প্রতিভাত হয়েছে। এবং আপাতভাবে তাদের দাম্পত্যপ্রেমের রূপটি নিস্তরঙ্গ হলেও কর্তব্যপরায়ণতার মোড়কে তাকে স্থায়িত্ব দেবার ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে।

• কুমুদ-মতি: অচেনা আকাশে মত্ত প্রেমের উড়ান---

গ্রাম্য সরলা মেয়ে মতি 'রাজপুত্র প্রবীর' ওরফে কুমুদের প্রেমে পড়ে। এক অবাক বিস্ময়ে সে যাত্রার বেশধারী কুমুদের দিকে চেয়ে থাকে, তার চলন-বলন লক্ষ্য করে মুগ্ধ হয়। মনে হয়, 'কুমুদ এ জগতের রক্তমাংসের মানুষ নয়, রূপকথার রাজপুত্র, মহাতেজা, মহাবীর্যবান, মহা-মহা প্রেমিক। হ্যাঁ কুমুদ মাটির পৃথিবীর কেহ নয়।' এক নিঝুম অলস দুপুরে তালপুকুরের ধারে মতি-কুমুদের বাক্যালাপ হয়, ধীরে ধীরে সখ্য গড়ে ওঠে এবং তা বিবাহে পরিণতি পায়। কুমুদের ভালোবাসার সোনার কাঠির স্পর্শে পরানের আদরের ছোটো বোনটি সম্পূর্ণ বদলে যায়। কিন্তু কুমুদের বন্ধু শশীর কাছে তাদের বিবাহ অসম। সে মনে করে কুমুদের মত ছেলে গেঁয়ো মতিকে নিয়ে দুদিনে হাঁফিয়ে উঠবে। কিন্তু কুমুদ জানায় – 'আমার সঙ্গিনী হতে পারে, এমন মেয়ে জগতে নেই ভাই – সঙ্গিনী আমার সৃষ্টি করে নিতে হবে আমাকেই।' সত্যিই কুমুদ তা করে দেখিয়েছিল। তাই দীর্ঘদিন বাদে দেখা মতিকে শশীর অচেনা মনে হয়েছে। মতির ভারী চলন, রমণীয় ভঙ্গিমা দেখে সে বাকরুদ্ধ হয়েছে।

কুমুদ বরাবরই গৃহবিমুখ, যাযাবর প্রকৃতির। মতি দুচোখে রঙিন স্বপ্ন মেখে তাকে জীবনে বরণ করেছিল, বা বলা ভাল বিবাহ করে কৃতার্থ হয়েছিল। কিন্তু কুমুদের রহস্যময় বেহিসাবি জীবনযাপনের ধরণ দেখে সে যারপরনারই বিস্মিত হয়েছিল, দুঃখ পেয়েছিল। সে একটা আশ্রয় চেয়েছিল, সুখনীড় রচনা করতে চেয়েছিল। কিন্ত কুমুদ অস্থির; অনিশ্চয়তার মধ্যে সে জীবনের

আনন্দ খুঁজে পায়। নিক্তিতে মাপা জীবনযাপন তার জন্য নয়। সে মুক্তপ্রাণ। ভালোবাসার মানুষকে দিয়ে সে পা টেপায়, কারণ তার 'বাঁচার আনন্দটাই খাপছাড়া'। বেপরোয়া খ্যাপাটে স্বভাবের এই পুরুষটির সংস্পর্শে এসে মতি প্রথমে দুঃখ পেলেও ধীরে ধীরে সে এই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তবে নিমরাজি হয়ে এই জীবনকে গ্রহণ করা নয়, সে কুমুদের এই জীবন-জুয়া খেলাটাকে ভালোবেসে ফেলে। কুমুদ বেপরোয়া স্বভাবের বলেই এটা ঠিক যে মতির সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হলে সে দুদিনে সামলে উঠবে, কিন্তু আমাদের মনে হয় মতি তা পারবে না। তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের ভাব আছে, যেমন ছিল '*সহরতলী* উপন্যাসের অজিত-সুব্রতার জীবনে।

কারণ 'ভিনদেশী-কাঁচপোকা' কুমুদ 'গাঁয়ের তেলাপোকা' মতিকে শুধু সম্মোহনই করেনি, পুরোপুরি গ্রাস করেছে। তাই অকপটে মতি বলে 'বেচে দেবে তো দাও না, সব গয়না বেচে দাও। ফুর্তি করি টাকাগুলো নিয়ে।' আসলে দায়িত্বহীনতার নেশায়, জীবনসমুদ্রে গা-ভাসানোর মাদকতায় মাতাল মতি-কুমুদ। তাই মতি গাওদিয়া ফেরে না, কুমুদের যাত্রাসঙ্গিনী হয় অবলীলায়। মতি যেন বলতে চায় – 'যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিনী/আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।'

হিসেবী শশী যা পারে না, বেহিসেবী কুমুদ তা করে দেখায়। তাই তালবন শশীর জীবনে বিরহক্ষেত্র হলেও, তালপুকুর হয়ে ওঠে কুমুদ-মতির প্রেমের লীলাক্ষেত্র। সহজ-সরলা গাঁয়ের মেয়ে প্রেমের এক নতুন রূপ প্রত্যক্ষ করে। 'হয়ত একদিন ওদের প্রেম নীড়ের আশ্রয় খুঁজিবে, হয়ত একদিন ওদের শিশুর প্রয়োজনে নীড় না বাঁধিয়া ওদের চলিবে না—' ঔপন্যাসিক সচেতনভাবেই 'হয়ত' শব্দটির দ্বিত্ব প্রয়োগে একটা ইঙ্গিত রেখে গেছেন। কে জানে কুমুদ- মতি সত্যিই কোনোদিন প্রয়োজনবশত নীড়রচনা করবে, নাকি নীড় বাঁধার প্রয়োজন (শিশুর জন্ম)-টাকেই নাগপাশ বলে মনে করে ভাসিয়ে দেবে, কে বলতে পারে। মনে রাখতে হবে উপন্যাসে তাদের প্রসঙ্গ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তারা সমাজে থেকেও সমাজ-বহির্ভূত, সংস্কার মুক্ত।

• বনবিহারী-জয়া: নিবিড় প্রেম যখন আস্থা হারায়---

উপন্যাসে বনবিহারী-জয়ার কাহিনিটি স্বল্পভাবে অঙ্কিত হলেও তা যথেষ্ট আকর্ষণীয়। প্রথমাবস্থায় এই দম্পতির প্রেমের সুন্দর সাংসারিক রূপ ফুটে উঠলেও তা অচিরেই ভেঙে যায়। টকটকে রঙের

সুন্দরী,স্মার্ট,আধুনিকা জয়া ভালোবেসে বিয়ে করে শিল্পী বনবিহারীকে। বেশ চলছিল তাদের সংসার সুখের প্রাচুর্য না থাকলেও শান্তির অভাব ছিলোনা। কিন্তু কুমুদ-মতির প্রখর ভালোবাসা জয়ার চিত্তবৈকল্যের সৃষ্টি করে। জয়া-কুমুদের কথার ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায় তাদের মধ্যে পূর্ব ঘনিষ্ঠতা ছিল, যা বন্ধুত্ব পেরিয়ে প্রেমের বলেই মনে হয়। তাই কুমুদ-মতির দাম্পত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে সরলা মতির থেকে জয়া খুঁটিয়ে জেনে নেয়, এমন 'গভীর ও গোপন যেসব কথা কারও কাছে কোনদিন প্রকাশ করা চলিতে পারে বলিয়া মতি ভাবিতেও পারে নাই।' আর যেসব কথা শোনার পর চলতে থাকে জয়ার মানসিক আলোড়ন এবং শেষ পর্যন্ত তার মনে হয় গত দুবছর ধরে বনবিহারীর সঙ্গে সে মিথ্যার 'মানস-স্বর্গ' রচনা করেছে, এক ব্যর্থ আর্টিস্টের সঙ্গে নিজের জীবনকে জড়িয়ে দুঃখের তপস্যায় রত থেকেছে। কিন্তু আজ তার মনে হয়েছে তার স্বামীর প্রতিভা ভুয়ো, সবটাই তার অতিরঞ্জিত সুখের কল্পনা। তাই যে ছবির ক্যানভাসকে জয়া গৃহদেবতার মতো যত্ন করত, সেই বিশেষ ছবিটিকে জয়া ছিঁড়ে খণ্ডবিখণ্ড করে দেয় এবং কুমুদ-মতিকে সেই বাড়ি থেকে উঠিয়ে দেয়। এরপর জয়া-বনবিহারীর আর কোনো সংবাদ পাওয়া যায়না, তবে তাদের পরিণতির একটা ইঙ্গিত ঠিকই পাওয়া যায় — 'বনবিহারী বিকালেই ফিরিয়া আসিয়াছিল, গম্ভীর বিষণ্ণ বনবিহারী। মতি দেখিল, সকালবেলার কাণ্ডে ওদের কথাবার্তা বন্ধ হয় নাই। বনবিহারী খাওয়া-দাওয়াও করিল, জয়াকে কয়েকটা টাকাও দিল। তবে দুজনের মধ্যে যেন অপরিচয়ের ব্যবধান আসিয়াছে, বড়ো মনমরা দুজনে।'

কিন্তু আমরা জানি প্রেম-ভালোবাসায় বিশ্বাসটাই মূল – 'বিশ্বাস ছাড়া ভালোবাসা? সে যেন রস ছাড়া রসগোল্লা, নুন ছাড়া ব্যঞ্জন।'(*ইতিকথার পরের কথা*)। হয়তো 'অপরিচয়ের ব্যবধান' নিয়ে বেঁচে থাকাটাই বনবিহারী-জয়ার নিয়তি।

• নন্দলাল-বিন্দু: প্রতিহিংসার শেষে অভ্যস্ত দাম্পত্যের আড়ালে প্রেম যখন বার্ধক্যের ভরসা---

গোপাল দাসের মেয়ে, শশীর আদরের বোন বিন্দুবাসিনীর বিয়ে হয় নন্দলালের সঙ্গে। এই বিয়ের পেছনে ছোট্ট একটা ইতিহাস আছে। গোপাল সুকৌশলে ছক করে বিত্তবান নন্দের সঙ্গে বিন্দুর বিয়ে দেয়। নন্দ বাধ্য হয়ে বিয়েটা করে কিন্তু এর প্রতিশোধ সে সুদে-আসলে তোলে বিন্দুর ওপর।

নন্দ মনে করে – 'গছাইয়া দেওয়া বউ, প্রাণভয়ে গ্রহণ করা বউ। লেখাপড়া নাচ-গান কিছু না জানা বউ, জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি।' পূর্বে বিবাহিত নন্দ বিন্দুকে আলাদা বাড়িতে রক্ষিতার মতো রাখে, মদ্যপানে অভ্যস্ত করে তোলে। ধীরে ধীরে গাঁয়ের মেয়ে বিন্দুকে কলকাতার অনামী রহস্য গ্রাস করে। অনেকবছর বাদে শশী প্রকৃত অবস্থা জেনে বিন্দুকে বাপের বাড়িতে ফিরিয়ে আনে কিন্তু বিন্দু স্বাভাবিক জীবনে স্বচ্ছন্দবোধ করে না। সে পুনরায় ফেরে নন্দর পাপের দুনিয়ায়। নন্দের মধ্যে এবার কিন্তু পরিবর্তন আসে। সে অনুতপ্ত হয়। সে শশীকে বলে, 'এবার তোমার সঙ্গে চলে গেল, পরের বার যদি জন্মের মতো আমাকে ত্যাগ করে বসে? বোঝা যায় বিন্দুর প্রতি একটা টান অনুভব করে সে, শত অন্যায় অসঙ্গত আচরণের পরেও। শুধু তাই নয়, সে বিন্দুকে তার পরিবারের সাথে গিয়ে বাস করার প্রস্তাব দেয়। বিন্দুর প্রতি সুপ্ত প্রেম তার বার্ধক্যের ভরসায় পরিণত হতে চায়। কিন্তু তাদের ট্র্যাজেডি এখানেই যে বিন্দু উত্তেজনাহীন পারিবারিক জীবনে সকলের মধ্যে ফিরতে আর রাজি হয় না।

যাদব-পাগলদিদি: বাঙালি ঐতিহ্যবাহী একনিষ্ঠ দাম্পত্য প্রেম---

যাদবকে যোগী, সিদ্ধপুরুষ হিসাবে গাওদিয়ার জনসাধারণ চেনে। কথার আকস্মিকতায় ও ঘটনার আবর্তে পড়ে গ্রাম গ্রামান্তরে রটে যায় তাঁদের ইচ্ছামৃত্যুর কথা। মানুষের ঢল নেমে মিথ্যে কথাটাকে সত্যি করতে প্ররোচিত করে। যাদবের স্ত্রী শশীর পাগলদিদি মুষড়ে পড়েন, আতঙ্কিত হন। শশীও বারবার যাদবকে তার কথা ফেরাতে বলে। কিন্তু যাদব ক্ষণেকের জন্য উৎসুক হয়েও পরমূহুর্তে তার মাহাত্ম্যে অবিশ্বাসী শশীর প্রতি ক্ষোভ উগড়ে দেন। পাগলদিদি শশীকে এক প্রকার অনুনয় করেন যাদবের মন বদলের জন্য। কিন্তু পরবর্তীতে নিজেও সংস্কারচালিত হয়ে স্বামীর সঙ্গ নেন। মিথ্যার মহত্ত্বকে মানুষের মনে অমর করে রাখার জন্য আফিম খেয়ে আত্মহনন করেন। বাঙালি নারী হিসাবে স্বামীর প্রতি পাগলদিদির একনিষ্ঠ প্রেম ছিল। স্বামীসোহাগিনী এই নারী স্বামীকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন বলেই সহমৃতা হয়েছিলেন। চর্মচক্ষুতে একে কুসংস্কার বলে মনে হলেও মনের আধিপত্যের উপর কবে আর যুক্তি চলেছে। যাদবের অনাড়ম্বর সরল জীবনের যোগ্য সহধর্মিনী পাগলদিদি।

• যামিনী কবিরাজ-সেনদিদি: সংশয়ী প্রেম যা সময়ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরও---

কবিরাজ যামিনী ও তার ঘরণী শশীর রূপসী সেনদিদির দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল অবিশ্বাসে ভরা। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন 'যে রূপের জন্য পৃথিবীর লোক উন্মাদ, স্ত্রীর যে সৌন্দর্য মানুষ তপস্যা করিয়া পায়না, যামিনী তাই পাইয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে তার রূপসী যুবতী স্ত্রীর দাস থাকার কথা, কিন্তু বাস্তবে সে সেনদিদিকে নিষ্ঠুর অবহেলা করে চলে।' আরও একটি তথ্য কাহিনিকার জানাতে ভোলেননি, তা হল – 'যামিনী কবিরাজের বৌ কিন্তু কখনো স্বামীর ওষুধ খায়না।' বোঝা যায় অসামান্যা সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি যামিনীর আছে অবজ্ঞা ও নিস্পৃহতা আর বিখ্যাত কবিরাজ স্বামীর প্রতি সেনদিদির আছে প্রবল অনাস্থা। এটা যে কোনও সুখী দাম্পত্যের চিত্র হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। তবে এখানেই শেষ নয়। মাঝে মাঝে স্ত্রীর প্রতি যামিনীর ব্যবহার ভারী অদ্ভুত, খাপছাড়া প্রকৃতির হয়ে ওঠে। সেনদিদির বসন্ত রোগ হলে সে নির্ণয় করে ম্যালেরিয়া। ডাক্তার শশী সেনদিদির রোগ নিরাময়ে ব্যস্ত হলে যামিনী তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। শশীর পিতা গোপালের সাহায্যে তাকে চিকিৎসা থেকে বিরত করতে চায়। মনে হয় যেন স্ত্রীর মৃত্যুতেই যামিনী স্বস্তিবোধ করবে। কিন্তু বিচিত্র মানবমনের কতটুকুই বা জানা যায়! কে জানে এই নিষ্ঠুর, সংশয়দীর্ণ সম্পর্কের মাঝে প্রেমের বা ভালোবাসার কোনো চোরাস্রোত বয়ে ছিল কিনা। তা না হলে উপন্যাসে তো একথাও পাওয়া যায় –

(১) স্ত্রী পাড়ায় কারও বাড়ি গেলে রাগে দুঃখে এক একদিন সে কাঁদিয়াও ফেলে।

(২) যামিনীর মুখ কয়েকদিনে সম্ভবত দুশ্চিন্তাতেই শুকাইয়া পাংশু হইয়া গিয়াছে।

(৩) সেনদিদির অসুখের সময় যামিনী বলে, আমায় একটা ওষুধ খাইয়ে দেবে শশী? তাড়াতাড়ি যাতে গুটি পাকে? আর সেনদিদি তার 'থুড়থুড়ে বুড়া' স্বামীকে এত যত্নে এত সাবধানে বাঁচিয়ে রাখে যে শীঘ্র তার পঞ্চত্বপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই।

• গোপাল-সরোজ (সেনদিদি): সমাজ নিন্দিত প্রেম—

শশীর পিতা গোপাল উপন্যাসে প্রথম থেকেই কুচক্রী রূপে উপস্থিত। অসৎ, শঠ, স্বার্থপর ও আরও নানা দোষে দুষ্ট গোপালের একটিই মাত্র সৎ গুণ ছিল অগাধ সন্তানবাৎসল্য (তাও মেয়েদের প্রতি নয়, কেবল শশীর প্রতি)। এহেন আপাদমস্তক সংসারী গোপালের সঙ্গে রূপসী সরোজ ওরফে

সেনদিদির সম্পর্কের কথা গাঁয়ের লোক কানাঘুষো করে। শোনা যায় একদা সেনদিদির দায়িত্ব তার ওপর বর্তানোয় সে দেড়শো টাকার বিনিময়ে বৃদ্ধ যামিনী কবিরাজের সঙ্গে যুবতী সুরূপা সেনদিদির বিবাহ দিয়ে দেয়, এমনকি অসুস্থ সেনদিদির চিকিৎসা যাতে শশী না করে তার জন্য সে চেষ্টার ত্রুটি করে না। কিন্তু ঘটনা পরিক্রমায় যামিনী কবিরাজ অসুস্থ হয়ে মারা যায় ও ইত্যবসরে বসন্তের করালগ্রাসে সেনদিদি অত্যন্ত কুরূপা হয়ে পড়ে। আর এরপর সকলকে অবাক করে দিয়ে—'বসন্ত যখন রূপ মুছিয়া লইয়া গেল সেনদিদির তখন মমতা আসিল গোপালের, এমন গভীর অবুঝ স্নেহ শশীকে যারপরনাই আহত করে সেনদিদি প্রায়শই তাদের বাড়িতে যাতায়াত করা শুরু করে। শশী অপমানিত বোধ করে। চিরকাল যে শত্রুতা করিয়াছে, ক্ষতি করিয়াছে অপূরণীয়, তার সঙ্গে বসিয়া সেনদিদি যে গল্প করিতে পারে'— তার স্পষ্ট কোনও কারণ শশী ভেবে পায় না।

সেনদিদির নাম যে সরোজ তা গোপালের মুখ থেকেই আমরা জানতে পারি। তার কাঁধে হাত রেখে শান্ত গলায় গোপাল কথা বলে। লেখক জানান দুঃখে কানা 'সেনদিদির কাছে গোপাল আজ সান্ত্বনা খুঁজিয়া মরে।' আর এরপর শশীকে হতবাক করে দিয়ে কিছুদিন বাদে জন্ম নেয় সেনদিদির পুত্রসন্তান। সন্তানের পিতা কে তা বুঝতে কারোর বাকি থাকে না। আর এমনই ট্র্যাজেডি যে নিজের পিতার সেই অবৈধ সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখায় শশী, গ্রামের শশী ডাক্তার। তবে মৃত্যু হয় সেনদিদির। আর ঘটনাচক্রে পড়ে গোপাল প্রথমে সেই শিশুকে নিজের গৃহে নিয়ে এলেও শশীর প্রবল অনীহা দেখে সে শিশুটিকে নিয়ে গ্রামত্যাগ করে চলে যায়। আপাত নিষ্ঠুর গোপাল শশী ছাড়া আরও একজনের প্রতি স্নেহ-বাৎসল্যে আবদ্ধ হয় পুনর্বার— সে সেনদিদির সন্তান। সেনদিদির প্রতি তার প্রেম বা ভালোবাসা সমাজে চূড়ান্তভাবে নিন্দার সম্মুখীন হলেও তার সন্তানকে সে অস্বীকার করতে পারে না কোনওভাবেই।

এছাড়া উপন্যাসে আরও কয়েকজন নারী-পুরুষের সম্পর্কের কথা পাওয়া যায়। যেমন –কুমুদ-জয়া। এদের মধ্যে বিবাহের পূর্বে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলেই জয়া কুমুদ-মতির দাম্পত্য জীবন দেখে ঈর্ষাবোধ করেছে। কুমুদকে সে অকপটে জানায় – 'চোখের সামনে তোমরা ভালোবাসবে আমি তা সইতে পারব নি।' আবার এমনই জটিল তার মন যে পরমুহূর্তেই কুমুদকে অপ্রতিভ করে দিয়ে প্রশ্ন করে –

> তুমি নিশ্চয় জানো কুমুদ, ওভাবে আমাকে তুমি কোনোদিন টানতে পারোনি? ওরকম আকর্ষণ আমার কাছে তোমার কোনোদিন ছিল না।

আবার বিদায়বেলায় কুমুদকে সে বলে তার খবর নিতে হলে কুমুদ যেন 'একা' আসে'। এমনই হেঁয়ালিতে ভরা জয়ার কথাবার্তা ও কুমুদের সঙ্গে তার সম্পর্ক। শশী-মতির কথাও বিক্ষিপ্তভাবে উপন্যাসে এসেছে। 'রসালো ফলের মতো' কোমল রঙের মতি শশীর মতো বর প্রত্যাশা করে – 'মতির ভারী ইচ্ছা, বড়োলোক বাড়িতে শশীর মতো বরের সঙ্গে তার বিবাহ হয়।' মতির কাছে 'পৃথিবীর সেরা লোক' হল শশী। শশীকে কেন্দ্র করে মতি ও কুসুম ননদ- বৌদির মধ্যে পরিহাস চলে (অন্যায় পরিহাসটা অবশ্য কুসুমই করে)। এখন মতি সম্পর্কে শশীর ভাবনার একটি রূপ তুলে ধরা যাক। সেনদিদির বাড়ি থেকে ফেরার সময় কোনও এক ভোরবেলায় শিউলিতলায় ফুল কুড়াতে ব্যস্ত মতিকে দেখতে পায় শশী –

> ওকে দেখিতে দেখিতে সকালবেলা বিড়ি টানার আলস্য আরও মিষ্টি লাগল শশীর। ... রোদ উঠিলে মতি বাড়ি গেল। শশী ভাবিল এমন গেঁয়ো স্বভাব, দেখতে তো গেঁয়ো নয়?
>
> আর মতি ভাবিল, শেষের দিকে ছোটোবাবু আমাকে কী করে দেখছিল? আমাকে দেখতে দেখতে কী ভাবছিল ছোটোবাবু?' (তৃতীয় পরিচ্ছেদ))

তবে এই সম্পর্ককে প্রেম বলে ভাবলে ভুল হবে। শশীর মনোভাবনা এখানে কোনো সতেজ সুন্দর নারীকে দেখে যে কোনো পুরুষের ভাবনার মতোই স্বাভাবিক। আর শশী যে একসময় মতিকে বিয়ে করতে চায়, তা কোনো প্রেমের বশবর্তী হয়ে নয়, কেবলমাত্র খাপছাড়া বেহিসেবি কুমুদের হাত থেকে মতির জীবনকে রক্ষা করার জন্য তার সেই প্রচেষ্টা দেখা যায়। তবে মতি তার স্বপ্নের রাজকুমার কুমুদের সঙ্গেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

এছাড়া উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মাত্র একবারের জন্যে গোপালের বড়ো মেয়ে অর্থাৎ শশীর বড়ো দিদি বিন্ধ্যবাসিনী ও স্বামী মোহনের প্রসঙ্গ এসেছে। মোহন বড়গাঁর নায়েব শ্যামাচরণ দাসের বড়ো ছেলে,তার একটি পা খোঁড়া— ঔপন্যাসিক তার সম্পর্কে এটুকু তথ্যই দিয়েছেন। মোহন-বিন্ধ্যবাসিনীর সংসার জীবনের বা প্রেমের কোনও চিত্র পাওয়া যায়নি উপন্যাসে।

প্রেমের গতি অবাধ। তার রূপও বিচিত্র। সমাজের মান্যতার উপর সর্বদা তার বিকাশ নির্ভর করে না। এমনই নানা প্রেম-অপ্রেম, পাওয়া-না পাওয়া, ভালো লাগা- মন্দ লাগায় ভরা '*পুতুলনাচের ইতিকথা*'। গাওদিয়া গ্রাম তাই শুধুমাত্র প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতুলালয় হিসেবেই জনপ্রিয় নয়, এটিকে চির বিখ্যাত করে দিয়েছে শশী-কুসুম-মতি-কুমুদরা।

গ্রন্থপঞ্জি:

কানাই সেন, ১৯৯৫, *মানিক-উপন্যাস: জীবনের জটিলতা*, কলকাতা, পুঁথি প্রকাশনা

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১৪, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, কলকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সি

সমরেশ মজুমদার, ২০০১, *পুতুল নাচের ইতিকথা: উপন্যাসের মৌলিক নির্মাণ*, কলকাতা, রত্নাবলী

সরোজ দত্ত, ১৯৯৩, *ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, কলকাতা, রত্নাবলী

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১২, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, কলকাতা, দে'জ

সুনীলকুমার দে, ২০০৭, *প্রসঙ্গ: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা'*, কলকাতা, বামা পুস্তকালয়

স্বস্তি মণ্ডল, ২০০৪, *শশীর স্বপ্ন শশীর বাস্তব: পুতুল নাচের ইতিকথা*, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

Matter developed by Smt. Piyali Khan, Assistant Professor of Bengali
Acharya Brojendra Nath Seal College, Coochbehar
Edited by the board of editors from W.B.S.C.H.E